A CRITICISM on Magh nada

BY

Kallyprosonno Roy.

—***—

মেঘনাদ সমালোচন।

—:*****:—

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় কৃত।

—****—

হুগলী।

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৭।

—***—

উৎসর্গ পত্র।

—০✱✱✱✱০—
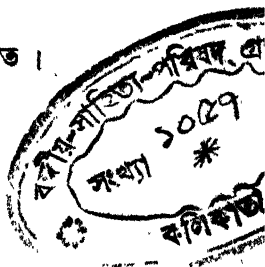
এই প্রবন্ধ খানি
উত্তর-মধ্য বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের ইন্‌স্পেক্টর
মহামতি শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের
অনুরাগ রসাভিষিক্ত করে

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় কর্ত্তৃক যথোচিত সম্মানসহকারে
সমর্পিত হইল।

—✱✱✱—

মেঘনাদ সমালোচন

—*******—
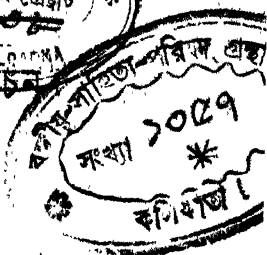
ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশের ন্যায় এক্ষণে আমাদের দেশেও নূতন পুস্তক সমালোচন করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই অচির প্রবর্ত্তিত সমালোচন প্রথা অতি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, সমালোচকগণের মধ্যে অনেকেই এমনি সহৃদয় ও দোষগুণ বিচারে এমনি নিপুণ, যে তাঁহারা সমালোচ্য কাব্যের যে সকল অংশ সাধারণ্যে সমাদৃত না হয়, সহসা সে সকল অংশের প্রশংসা করিতে সাহসী হন্ না। তাঁহাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের প্রতি ধাবিত হয়। ড্রাইডন নামক একজন ইংলণ্ডীয় কবি এক স্থলে লিখিয়াছেন, কাব্যরূপ সমুদ্রের উপরিভাগে তৃণ তুল্য লঘু দোষ সকল ভাসিতে থাকে। যাঁহারা মুক্তালাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে গভীর নিম্নে নিমগ্ন হইতে হইবে। বাঙ্গালি সমালোচক সমাজের এই দুইটী কথা নিরন্তর অন্তঃকরণে জাগরূক রাখা আবশ্যক।

বস্তুতঃ যাঁহারা কাব্যের প্রকৃতরূপে সমালোচন করিবার বাসনা করেন, কাব্যের অপকর্ষ অপেক্ষা উৎকর্ষের উপরে তাঁহাদের অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। কাব্যের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য ও কাব্যের যে সকল বিষয় জনসাধারণের দর্শন যোগ্য, সেইগুলি ব্যক্ত করাই তাঁহাদের উচিত।

মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচন করাই আমার এ ক্ষুদ্র সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য। কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থের দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে নানাশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণের আবশ্যক, আমার সে সকল কিছুই নাই; সুতরাং আমি মেঘনাদের সমালোচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি কিন্তু কেহ একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ প্রদর্শন করিয়া কাব্যকারের কবিকীর্ত্তি লোপের চেষ্টা পাইলে সাহিত্যানুরাগী কোন্ ব্যক্তি, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন ?

কোন কাব্যের প্রকৃতরূপে সমালোচন করিতে হইলে প্রথমতঃ কাব্যের স্বরূপ, বিভাগ ও সমালোচ্য কাব্য কোন্ বিভাগের অন্তর্ভূত, তৎসমুদায়ের নিরূপণ করা আবশ্যক। আলঙ্কারিকেরা রসভাব-

সমন্বিত চমৎকার-জনক রচনাকে কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সামান্যতঃ কাব্য দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্যকাব্য। যে কাব্য কেবল শ্রবণ করা যায়, তাহাকে শ্রব্য কাব্য এবং যাহার শ্রবণ ও রঙ্গভূমিতে অভিনয়কালে দর্শনও হয়, তাহাকে দৃশ্য কাব্য কহে। মেঘনাদ ঐ প্রথমোক্ত কাব্য-শ্রেণিতে পরিগণিত। বর্ণনীয় বিষয় অনুসারে উহার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার নায়ক মেঘনাদ *।

* সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নায়ক নায়িকা সংক্রান্ত যে সমস্ত লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; তদনুসারে মেঘনাদ, মাইকেল প্রণীত মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন না। কারণ চরমাবস্থায় নায়কের অমঙ্গল অথবা নিধন তাঁহাদের মতে বৈধ নহে, কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় নায়ক শব্দের সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত সেই প্রাচীন অর্থ রক্ষা করিবার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। যে ইতিবৃত্ত মধ্যে প্রধানতঃ যাঁহার চরিত কীর্ত্তিত থাকে এবং যাঁহার স্বভাবের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করাই রচয়িতার মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনিই সেই ইতিবৃত্তের নায়ক এইরূপে নায়ক শব্দের অর্থাবধারণ করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই।

উহা বীর রসাশ্রিত*। যদিও উহাতে সন্ধি, বিগ্রহ ও অনিষ্ট ঘটনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা থাকাতে বীর, করুণ ও রৌদ্র প্রভৃতি অনেক রসের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সচরাচর কাব্যে নায়ক যে রসের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হন, সেই রসেরই প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

মেঘনাদ নয়সর্গে বিভক্ত। প্রথমসর্গে বীরবাহুর রণস্থলে নিধন বার্ত্তা শ্রবণে লঙ্কেশ্বরের বিলাপ, বীরবাহু-জননী-চিত্রাঙ্গদার সভাস্থলে আগমন ও আক্ষেপোক্তি, চিত্রাঙ্গদার প্রতি লঙ্কেশ্বরের প্রবোধ বাক্য ও লঙ্কেশ্বর কর্ত্তৃক মেঘনাদের সেনাপতি পদে বরণ। দ্বিতীয়সর্গে রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মীর প্রবর্ত্তনায় ইন্দ্রজিৎ বৈরি ইন্দ্রের শচীসহ কৈলাসধামে গমন ও ভগবতীর স্তুতি। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অকালে ভগবতীর পূজা, মহাদেবের প্রসাদে লক্ষ্মণের অস্ত্রলাভ। তৃতীয়সর্গে ইন্দ্রজিৎজায়া প্রমীলার লঙ্কাপুরে প্রবেশ এবং মেঘনাদের সহিত পুনঃ সম্মিলন। চতুর্থসর্গে অশোক বনে বিভীষণ জায়া সরমার সহিত সীতার কথোপকথন ও পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সীতার

* গ্রন্থকার কাব্যের প্রারম্ভে সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত, উরি দাসে দেহ পদ ছায়া।

আক্ষেপ। এইরূপ এক এক সর্গে প্রকৃত প্রস্তাবে উপ-যোগী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সকল সুন্দররূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার ঐ সকল স্থলে আপনার অসাধারণ কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেঘনাদকার যে প্রণালীতে কাব্যের আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় কবিগণের অভ্যস্ত নহে। কোন একটী গল্পের শেষ অথবা মধ্যভাগ লইয়া কাব্য আরম্ভ ও প্রসঙ্গক্রমে উহাতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবতীর্ণ করিবার রীতি প্রথমতঃ গ্রীশদেশের আদি কবি হোমার প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপরে ইউরোপের অপরাপর স্থলে ঐ রীতি প্রচলিত হয়। মেঘনাদেও ঐ প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। মেঘনাদকার গ্রীশদেশের মহাকাব্য হোমারকৃত ইলিয়ডকে আদর্শ করিয়াই চলিয়াছেন। ইলিয়ডে ট্রয়যুদ্ধে দেবগণের হস্তক্ষেপ করিবার বিষয় বর্ণিত আছে, মেঘনাদে সেইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের লঙ্কাসমরে অবতীর্ণ হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইলিয়ডে ট্রয় অধিপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র হেক্টরের বধবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, মেঘনাদেও লঙ্কাধিপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিতের বধ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ কিঞ্চিৎ মনঃ-সংযোগপূর্ব্বক উভয় কাব্য পড়িয়া দেখিলে হোমার

রুস্ত ইলিয়ড আদর্শ ও মেঘনাদ তৎপ্রতিরূপ বলিয়া প্রতীতি হইবে সন্দেহ নাই।

কবি, বীরবাহুর পতন হইতে কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু কাব্য মধ্যে পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবতীর্ণ না করিলে গল্পটী অসংলগ্ন হয়। এই নিমিত্ত মেঘনাদ-কার প্রসঙ্গক্রমে উহাতে আদি, অযোধ্যা ও অরণ্যকাণ্ডের বিবরণ অতি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অষ্টম সর্গে যমপুরী বর্ণনাবসরে রাম-চন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁহার পিতৃপুরুষগণের বিবরণ মনোহররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং চতুর্থসর্গে সীতার সহিত সরমার কথোপকথন সময়ে মারীচের মায়া মৃগরূপধারণ, মৃগশিকারের নিমিত্ত রামচন্দ্রের গমন, লঙ্কেশ্বরকর্ত্তৃক সীতাহরণ, পথিমধ্যে জটায়ুর সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে জটায়ুর নিপাত এই সকল পূর্ব্ববৃত্তান্ত সুন্দররূপে বিন্যস্ত আছে। পাঠকগণ নিম্নে উদ্ধৃত অংশ দেখিলে জানিতে পারিবেন।

—***—

অষ্টম সর্গ।

বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, পশ্চিমদ্বার দেখ, রঘুমণি!
হিরণ্ময়; এ সুদেশে হীরক নির্ম্মিত

গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণ বৃক্ষমূলে,
মর কত পত্র ছত্র দীর্ঘ শিরোপরি,
কনক আসনে বসি দিলীপন্থমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু!"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতীর পদতলে; সুধিলা আশীষি
দিলীপ "কে তুমি? কহ, কেমনে আইলা
স শরীরে প্রেত দেশে, দেবাকৃতি রথি?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দ সলিলে
ভাসিল হৃদয় মম" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ব্বে তোমা ধরিল, সুমতি?
দেব কুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি
কেন বন্দ আমা দোঁহে? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নর দেবরূপে?

উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলি পুটে,—
ভুবন বিখ্যাত পুত্র রঘুনামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্‌বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে
সুমিত্রা জননী পুত্র লক্ষ্মণ কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে!

—***—

চতুর্থ সর্গ।

কহিলা সরমা; দেবী, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর কথা তব সুধামুখে
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধাবরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।

কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর; কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী,
মধুর ভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া। ইত্যাদি—

গ্রন্থকার গ্রীক্ ও রোমীয় কবিগণের প্রথানুসারে কাব্যের মধ্যে মধ্যে কবিকুলগুরু বাল্মীকি ও সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছেন। পাঠকগণের দর্শনার্থ এ স্থলে একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। গ্রন্থকার চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে লিখিতেছেন।

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি*! হে ভারতের শিরঃ চূড়ামণি,

* বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে অনেকেই রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া অনেক কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু যিনি সর্ব্বাগ্রে রামায়ণ লিখিয়া রামচন্দ্রের বিশুদ্ধ চরিত্রের বিষয় জনসাধারণের

তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি; সুরী ভবভূতী
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস সুমধুর ভাষী;
মুরারি-মুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি
মনোহর; কীর্ত্তিবাস, কৃত্তিবাস কবি
এ বঙ্গের অলঙ্কার!—হে পিতঃ কেমনে
কবিতা-রসের সরে রাজহংস কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর; কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।—

গোচর করেন, আদি কবি সেই বাল্মীকির প্রতি কেহই ভক্তি প্রদর্শন করেন নাই। অতএব মেঘনাদকার বাল্মীকির বন্দনা করিয়া তাঁহাদের ঐ অশিষ্ট ব্যবহারের পরিহার করিলেন।

গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে এইরূপ সম্বোধন করিবার রীতি এতদ্দেশীয় কবিগণের অভ্যস্ত নহে। কিন্তু ঐ রীতি যে অতি প্রশংসনীয়, বোধ হয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। উহা দ্বারা গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও শ্রোতৃজনে অবধান আধান করা হয়। গ্রন্থকার যে যে স্থলে ঐরূপ সম্বোধন করিয়া প্রস্তুত বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন, গ্রন্থের অপরাপর স্থল অপেক্ষা গুরুতর বিবেচনায় ঐ সকল অংশ পাঠকবর্গের অধিকতর মনোযোগের বিষয় হয় সন্দেহ নাই।

এক্ষণে মেঘনাদের উপাখ্যান, নায়ক ও প্রতি-নায়কের গুণ, ভাব এবং রচনার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

গ্রন্থকার, মেঘনাদের উপাখ্যানটী রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু রামায়ণের সহিত উহার অতি অল্প ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার আপনার অসাধারণ কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে উহার অনেক অংশ নূতন করিয়া লইয়াছেন। আমাদের দেশে রামায়ণের উপাখ্যান কাহার অবিদিত নাই। যেরূপে রাম লক্ষ্মণের জন্ম হয়, যেরূপে রামচন্দ্র সীতার পানি গ্রহণ করেন, যেরূপে বিমাতার কুমন্ত্রণায় অরণ্যে যান ও তথা হইতে

সীতাহরণ জন্য লঙ্কাধিপতি রাবণকে সবংশে ধ্বংস করেন, হিন্দুজাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তত্তাবৎ অবগত আছেন। অতএব মেঘনাদকাব্যের উপাখ্যানের কোন্ অংশ রামায়ণ হইতে গৃহীত ও কোন্ অংশ কবির স্বকপোল কল্পিত, তাহা পাঠক মাত্রই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

ইউরোপের প্রাচীনকালের সর্ব্বপ্রধান সমালোচক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক আরিষ্টটেল লিখিয়াছেন, মহাকাব্যের উপাখ্যানে এরূপ সকল ঘটনা বর্ণনা করা উচিত, যেগুলি জনসাধারণের বিশ্বাস যোগ্য ও বিস্ময়াবহ হইতে পারে। তাঁহার কৃত এই নিয়মটী যে অতি উৎকৃষ্ট ও ন্যায়ানুগত বোধ হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি মহাকাব্যের উপাখ্যান কেবল বিশ্বাস যোগ্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃত ইতিহাসের সহিত উহার কোন প্রভেদ থাকে না এবং যদি উহা শুদ্ধ বিস্ময়াবহ হয়, তাহা হইলে উহাকে আরেবীয় উপন্যাস প্রভৃতির ন্যায় কল্পিত উপন্যাস ব্যতিরেকে আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। অতএব মহাকাব্যের একটী প্রধান রহস্য এই যে, উহাতে বর্ণিত ব্যাপারগুলি পড়িলে পাঠকের অন্তঃকরণে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জন্মে। মেঘনাদের উপাখ্যানটী সম্পূর্ণরূপে ঐ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে।

লঙ্কাসমরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অবতরণ, মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য ভগবতীর মোহিনীবেশে গমন, মহাদেবের ইচ্ছায় পুত্রবধামর্ষ-প্রদীপ্ত রাবণের বিপক্ষ সংহারার্থ রুদ্ররূপ ধারণ, মহাদেবের আদেশে অগ্নিদেবের দাহস্থলে আবির্ভাব ও চিতার ভস্মীকরণ প্রভৃতি ঘটনাগুলি কেবল যে বিস্ময়কর এরূপ নহে, ঐ সকল ঘটনার প্রতি জন-সাধারণের শ্রদ্ধাও জন্মিতে পারে। সত্য বটে, উপাখ্যানে বর্ণিত দুই একটী ঘটনার সহিত পৌরাণিক মতের ঐক্য হয় না, কিন্তু তাহাতে উপাখ্যানের দোষ হইতে পারে না। কবিগণের এরূপ রীতি আছে, যে তাঁহারা উপাখ্যানের কোন কোন অংশ নূতন করিয়া মহাকাব্যে নিবেশিত করিয়া থাকেন। মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলে উহার অনেক প্রমাণ উপলব্ধ হইতে পারে।

ষষ্ঠসর্গে বর্ণিত হইয়াছে, মেঘনাদ যেমন্দিরে বসিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত ইষ্টদেবের আরাধনা করিতেছিলেন, লক্ষ্মণ বিভীষণ সমভিব্যাহারে মায়ার প্রভাবে অদৃশ্য হইয়া তথায় প্রবিষ্ট হন্। মেঘনাদ সহসা দেবাকৃতি তেজস্বী পুরুষকে সমাগত দেখিয়া অগ্নিদেব ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করেন, কিন্তু তাঁহার সহিত কথোপকথনের দ্বারা পরিশেষে মেঘনাদের

সেই ভ্রম ভঞ্জন হয়; তখন তিনি লক্ষ্মণকে কোষা ফেলিয়া মারেন, সেই কোষার আঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই ঘটনাটী বাহ্য দৃষ্টিতে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অনেকের বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ঐ স্থলে বিভীষণের সহিত মেঘনাদের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন বর্ণনার অবসরলাভ করাই কবির লক্ষ্মণকে কিয়ৎক্ষণ মূর্চ্ছিত করিয়া রাখিবার প্রধান উদ্দেশ্য। যৎকালে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত থাকেন, ঐ সময়ে বিভীষণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। মেঘনাদ প্রথমতঃ লক্ষ্মণের দেবদত্ত অস্ত্র টানিয়া লইবার চেষ্টা পান, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র আনিবার সঙ্কল্প করেন ও দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত মাত্র নিজ পিতৃব্য বিভীষণকে শূল হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া চমকিয়া উঠেন ও বিষন্নচিত্তে তাঁহারে এই রূপে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে—

জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভু নিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসব বিজয়ী?

নিজ গৃহ পথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।
উত্তরিলা বিভীষণ; বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ? উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—ইত্যাদি।

বোধ হয়, কবি ইহা অপেক্ষা সুকৌশলে বিভীষণের সহিত মেঘনাদের ঐরূপ কথোপকথন বর্ণনা করিতে পারিতেন না। ফলতঃ কুসংস্কার বিহীন হইয়া সম্যক্ সহৃদয়তা সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মেঘনাদের উপাখ্যানটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে। উহার যে সকল অংশ কবির স্বকপোল কল্পিত, সে গুলি এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনার দ্বারা পরিপূরিত, যে তৎপাঠে পাঠকমাত্রকেই চমৎকৃত হইতে হয়। এমন কি, যদি কেহ পূর্ব্বকালে ঐরূপ গল্প রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে উহা পুরাণ বলিয়া সাধারণ্যে সমাদৃত হইত।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কহেন, বীররস উৎকৃষ্ট-পুরুষে বর্ণনীয়। কবি, মেঘনাদকে যে সকল সদ্গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে বীর-রসে বর্ণনীয় হইবার যোগ্যপাত্র সন্দেহ নাই। কাব্যে প্রতি নায়ককে নায়কের অনুরূপ করিয়া বর্ণনা করা উচিত। মেঘনাদকার ঐ নিয়ম প্রকৃতরূপেই প্রতি-পালন করিয়াছেন। নায়ক মেঘনাদ যেরূপ বীর-লক্ষণাক্রান্ত, প্রতিনায়ক লক্ষ্মণও সেইরূপ বীরোচিত গুণগ্রামে তাঁহার অপেক্ষা কোনরূপে নিকৃষ্ট নহেন। পাঠকগণ নিম্নে উদ্ধৃত অংশ দেখিলে জানিতে পারিবেন।

গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নি শিখা সম শর; ভীম সিংহ নাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী—
ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!”
বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে!

সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, " বাখানি
বীরপণা তোর্ আমি, সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তি ধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!"

—******—

বীর রসাশ্রিত কাব্যে স্বভাবানুযায়ি ও উন্নত ভাব সকল সন্নিবেশিত করা বিধেয়। গ্রন্থকার এই নিয়মটীর প্রতি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন। মেঘনাদে প্রায় কোন স্থলে এরূপ কোন ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা অনৈসর্গিক ও হেয় বলিয়া বোধ হয়। মেঘনাদে উন্নত ভাবের বর্ণনা কিরূপ হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

পুত্রশোকে কাতর রাবণের বিলাপ ও পরিতাপ শ্রবণে কৈলাসধামে ভক্তবৎসল মহাদেবের অধীরতা।

অধীর হইলা শূলী কৈলাস আলয়ে!
নড়িল মস্তকে জটা, ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে, ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, রবিষায় যথা

বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বত কন্দরে!
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে!
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে,—

এই উদাহরণে বর্ণনীয় মহাদেবের ক্রোধ যেরূপ মহৎ তাহার বর্ণনাও তদনুরূপ হইয়াছে। সংক্ষেপে সমালোচন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য; নতুবা দেখান যাইত, মেঘনাদে ঐরূপ উন্নত ভাবের বর্ণনা কত আছে।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে, যে বীর ও রৌদ্র প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর রসের উদ্দীপন করাই বীররসাশ্রিত কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং উহাতে হাস্য ও আদিরস ঘটিত ভাব নিবেশিত করিলে প্রায় তাহার সৌন্দর্য্য থাকে না। কবি হাস্যরসোদ্দীপক ভাবের পরিহারে যেরূপ যত্নবান ছিলেন, বোধ হয়, আদিরসের বর্ণনায় সর্ব্বত্র সেরূপ সাবধান হইয়া চলিতে পারেন নাই। তিনি একটী অনুচিত স্থলে আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গের যেস্থলে ভগবতী রামচন্দ্রের পূজায় প্রসন্ন হইয়া কামদেবকে সঙ্গে করিয়া মোহিনীবেশে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে যান; ঐ সময়ে কাম কহিতেছেন।

প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল পদে,
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ জগত, হেরিলে
ওরূপ মাধুরী;——————

যাঁহাকে মাতঃ বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়, তাঁহার সমক্ষে তাঁহার রূপের ঐরূপ বর্ণনা করা অনুচিত, কিন্তু এ স্থলে ঐ বর্ণনাটী কামদেবের মুখ হইতে বিনির্গত হইতেছে বলিয়া তত দুষ্য নহে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্গীয় কবিগণ করুণ ও আদিরস সংক্রান্ত বর্ণনা যেরূপ মনোহর করিতে পারেন, তাঁহাদের বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসের বর্ণনা সেরূপ মনোহারিণী হয় না। ইতি পূর্ব্বে যে সকল পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত ব্যতিরেকে অন্য কোন গ্রন্থে বীর ও রৌদ্ররসের বর্ণনা বিরল। এত বিরল, যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ বঙ্গীয় কবিগণ নায়ক নায়িকার প্রথম দর্শন, পূর্ব্বানুরাগ ও বিরহ প্রভৃতির বর্ণনা

করিতে যেরূপ নিপুণ, যুদ্ধ, বিস্ময়, পর্ব্বত ও সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনাতে সেরূপ নিপুণ নহেন। মেঘনাদকাব এ বিষয়ে তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিযাছেন। বোধ হয়, বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে কি প্রাচীন কি আধুনিক কেহই বীর ও রৌদ্ররসের বর্ণনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী নহেন।

মেঘনাদের ভাষা সম্বন্ধে বাঙ্গালি সাহিত্য সমাজেব অতিশয় মত ভেদ লক্ষিত হইতেছে, যদি তাঁহাদেব সহিত আমার ক্ষুদ্র মতের অনৈক্য ঘটে, তবে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

মেঘনাদের ন্যায় বীর রসাশ্রিত কাব্যে ভাষার সুপরিস্ফুটতা ও সুগভীরতা থাকা আবশ্যক। মেঘনাদের ভাষা শেষোক্তগুণে যেরূপ ভূষিত, প্রথমোক্তগুণে সেরূপ হয় নাই। মেঘনাদের কোন কোন স্থলের অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না; সুতরাং সেই সেই স্থল প্রসাদগুণ সম্পন্ন নহে। নিম্নে উহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

কামদেব ভগবতীর রূপ বর্ণনা করিবার সময়ে কহিতেছেন।

মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি কত মনোহর!"——

এই উদাহরেণ প্রথম পংক্তিতে "মলম্বা অম্বরে তাম্র" এই কয়েকটী পদের তাঁমায় গিল্টী করিলে রূপ ভাবার্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। অতএব ঐ স্থলটী প্রসাদগুণ সম্পন্ন হয় নাই। কিন্তু যখন লক্ষিত হইতেছে, মেঘনাদ, ভাবের চমৎকারিতা, রচনার ওজস্বিতা ও উপাখ্যানের মনোহারিতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃত; তখন উহার উক্ত প্রকার দুই একটী ক্ষুদ্র দোষ গ্রহণীয় নহে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা আমার এই বাক্যে অসন্তুষ্ট হন, আমি তাঁহাদিগকে নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটী দেখিতে অনুরোধ করি। মহাকবি কালিদাস কুমার সম্ভবের প্রারম্ভে বহুগুণাকর হিমালয় পর্ব্বতের বর্ণনাবসরে কহিতেছেন।

এ কোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষু অঙ্কঃ

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, যদি কেবল প্রসাদ গুণ থাকিলেই কাব্যের উৎকর্ষ সিদ্ধি হইত, তাহা হইলে কাব্যকারদিগকে আর কিছুই করিতে হইত না, শুদ্ধ সরল ও স্বভাবানুযায়িনী বর্ণনাদ্বারা ভাবগুলিকে অলঙ্কৃত করিলেই চলিত। কিন্তু যখন এরূপ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে সকল পদাবলী অতিশয় প্রসাদ গুণসম্পন্ন ও সামান্য

কথোপকথনে যে সকল পদাবলী ব্যবহৃত হয় এবং সামান্য লোকের মুখ হইতে বিনির্গত হওয়াতে যে সকল পদাবলীর এক প্রকার গ্রাম্যতা দোষ জন্মে; তখন কাব্যকারদিগকে সেই সকল পদাবলীর ব্যবহারে সবিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। অন্যথা কাব্যের উপাদেয়ত্ব সম্ভবে না। সামান্য কবিওয়ালাদিগের গীত যে এক্ষণে উন্নতিশীল সাহিত্য সমাজে জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, প্রচলিত পদাবলীর প্রয়োগ বিষয়ে অসাবধানতা তাহার একটী প্রধান কারণ। প্রথম উদ্যমে মুখ হইতে যে সকল কথা বাহির হইয়াছিল, বোধ হয়, তাঁহারা গীত মধ্যে অবিকল সেই সকল কথা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া উৎকৃষ্ট পদাবলীর নির্ব্বাচন করেননাই নতুবা তাঁহাদের কবিত্বশক্তি ছিল না এমত নহে। সে যাহা হউক, মেঘনাদে গ্রাম্যতা দোষ অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে উদ্ধৃত উদাহরণে "খেদাইয়া" শব্দের ন্যায় মেঘনাদের দুই এক স্থলে নীচভাষায় বিন্যস্ত দুই একটী পদ লক্ষিত হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ সর্গে যজ্ঞাগারে মেঘনাদ, যখন লক্ষ্মণের প্রতি শংখ ঘণ্টা নিক্ষেপ করেন; ঐ সময়ে কবির উক্তিতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান্ মশক বৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
কর পদ্মসঞ্চালনে!———

ভাষার রচনা বিষয়ে সুনিপুণ পণ্ডিতেরা বিলক্ষণ-রূপে অবগত আছেন, সাধারণের ব্যবহার দ্বারা যে সকল পদাবলী দূষিত হইয়া গিয়াছে, মনোহর হইলেও সে গুলি কবিগণের ব্যবহারোপযোগী হয় না। মৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন কবিগণের কাব্য, বর্ত্তমান সময়ের চলিত ভাষায় সঙ্কলিত কাব্য অপেক্ষা যে অধিকতর সমাদৃত হইয়া থাকে, উহা তাহার একটী অন্যতর কারণ সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, উন্নত ও গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক না হইলে শুদ্ধ প্রসাদগুণ কাব্যের ভাষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। কবিদিগকে ভাষার গাম্ভীর্য্য সাধনার্থ সময়ে সময়ে সামান্য কথোপকথন করিবার রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হয়। এই নিমিত্ত ভবভূতি ও মিল্টন প্রভৃতি অলৌকিক কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন গ্রন্থকারগণের কাব্যেরও কোন কোন স্থল প্রসাদগুণ বিবর্জ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ যাঁহারা ভাষার উদারতা রক্ষণে যত্নবান হন, তাঁহাদের রচনা অনেক স্থলে প্রসাদগুণসম্পন্ন হয় না।

মেঘনাদে অধিক পরিমাণে সাড়ম্বর সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার উহার অনেক স্থলে ঘোর ঘটা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত পদাবলী ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু উহা দোষ না হইয়া গুণ হইয়াছে। শব্দাড়ম্বর অমিত্রাক্ষর ছন্দের অলঙ্কার স্বরূপ, শব্দাড়ম্বর না থাকিলে অমিত্রাক্ষর পদ্যের সুশ্রাব্যতা সম্পাদন হয় না। ইউরোপীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আডিসন স্বপ্রণীত "এস্পেক্টেটর" নামক পত্রিকায় মিল্টনের দোষগুণ বর্ণনাবসরে উহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এস্থলে এ কথা বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না, যে মেঘনাদকারের ভাব ও অভিপ্রায় যেরূপ উন্নত, তাঁহার রচনাও তদনুরূপ হইয়াছে। যদি তিনি বঙ্গীয় কবিগণের অভ্যস্ত শব্দাবলীতে মেঘনাদ রচনা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় উহার উপাদেয়ত্ব না জন্মিয়া বরং হেয়ত্বই ঘটিত।

জগতে যাবতীয় বিষয় পরিবর্ত্তনশীল। কি সামাজিক নিয়ম, কি শিক্ষাপদ্ধতি, কি রচনাপ্রণালী, কালক্রমে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে। অতএব এরূপস্থলে প্রাচীন পদ্ধতির নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া থাকাও উচিত নহে। সচরাচর

নয়নগোচর হয়, অনেকে চিরাভ্যস্ত পদ্ধতির রেখা মাত্র অতিক্রম করিতে চাহেন না এবং কাহাকে অতিক্রম করিতে দেখিলেও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের "কেবল পরিবর্ত্তনই নিত্য" এই চিরপ্রসিদ্ধ বাক্যটী নিরন্তর চিত্তপটে জাগরূক রাখা কর্ত্তব্য এবং সেই পরিবর্ত্ত দ্বারা জগতের কতদূর উপকার হইতে পারে, তাহাও একবার পক্ষপাত-শূন্যচিত্তে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

মেঘনাদবধ কাব্যে ব্যাকরণদুষ্ট কতকগুলি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে সত্য এবং ঐ পদগুলি অনভ্যাস বশতঃ হউক, অথবা অন্য কোন কারণে হউক, আপাততঃ আমাদের শ্রুতি কঠোর বলিয়াও বোধ হইতেছে। এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক, ঐ নূতন রকমের পদগুলি কোন সময়ে আমাদের শ্রুতি মধুর হইতে পারে কি না এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন পক্ষে অনুকূল হইবে কি না, এই দুইটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, কাল-ক্রমে ঐ নূতন পদগুলির শ্রুতি কটুত্ব দোষ পরিহৃত হইয়া যাইবে এবং তদ্দ্বারা ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এক্ষণে বাঙ্গালী ভাষা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে উপনীত হইয়াছে। অত-এব এখনও উহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ব্যাকরণ হইবার

সময় উপস্থিত হয় নাই। যেমন কোন ব্যক্তি কৌমা-রাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হই-লেও পরিণামে তাহার কিরূপ প্রকৃতি হইবে, তাহা যেমন সম্পূর্ণরূপে অনুমিত হয় না, কিন্তু তাহার তখনকার কোন কোন বিষয়ে অভিনিবেশ বিশেষ দেখিয়া ভাবী স্বভাবের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষারও এক্ষণে ঠিক্ সেইরূপ অবস্থা। বাঙ্গালা ভাষা উত্তরকালে কিরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, অধুনা তাহা নিঃশংসয়ে নির্ণয় করা সুক-ঠিন; তবে এক্ষণে ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে অধুনাতন পণ্ডিতেরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেছেন, ভবিষ্যতে সেইগুলি আদর্শ স্বরূপ হইবে। তখন বর্ত্তমান সময়ের অসম্পন্ন ব্যাকরণানুসারে নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া কেহ ঐ সকল শব্দের ব্যবহারে সঙ্কুচিত হইবেন না *।

* এই বাক্যের দৃষ্টান্ত স্থলে কৃষক, সৃজন ও সততা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ গৃহীত হইতে পারে। ব্যাকরণানুসারে ঐ সকল শব্দের রূপ করিতে হইলে কর্ষক, সর্জ্জন ও সত্তা হয়। কিন্তু বঙ্গীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থকারেরা কিছুকাল অবধি প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া এক্ষণে কেহই ঐ সকল শব্দ ব্যাকরণ দুষ্ট বিবেচনা করেন না; প্রত্যুত সকলেই অসঙ্কুচিত চিত্তে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে, যে এক্ষণে যেরূপ ভূরি পরিমাণে সংস্কৃতশব্দ সন্নিবেশিত করাতে বাঙ্গালাভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, সেইরূপ বিদেশীয় ভাষার বাক্য বিন্যাসের রীতি অধিক পরিমাণে ব্যবহারকরিলেও উহার অধিকতর উৎকর্ষলাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতবর আরিষ্টটল, পরকীয় ভাষার শব্দ বিন্যাসের প্রণালী অবলম্বন করাকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধির একটী উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যে ইংরেজী ভাষার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে, উল্লিখিত উপায়ের অনুসরণ তাহার একটী প্রধান কারণ। মেঘনাদকার, ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণের সুপ্রথানুসারে স্বরচিত কাব্যের কোন কোন স্থলে গ্রীক্ ও রোমীয় প্রভৃতি ভাষার রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। পাঠকগণের সন্তোষার্থ নিম্নে উহার দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে!——————
কোমল কণ্ঠে স্বর্ণ কণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠে! সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্ত সৌরভা সুখী বাসন্তীরে সতী
কহিলা,———

প্রথম উদাহরণে "উলঙ্গিলা অসি" এই বাক্যটী ও দ্বিতীয় উদাহরণে বাসন্তীর "বসন্তসৌরভা" এই বিশেষণটী রোমীয় ও গ্রীক্ ভাষার বাক্য বিন্যা-সের রীতি অনুসারে নিবেশিত হইয়াছে।

পরকীয়ভাষানভিজ্ঞ, কুবিতর্কী ও কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা মেঘনাদকারের ঐরূপ স্বাধীনতা দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন বটে, কিন্তু যাঁহারা ইংরেজী ফরাশী প্রভৃতি চারি পাঁচ ভাষার আলো-চনা করিয়া তত্তৎ ভাষার শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ সকল অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, মেঘনাদকার বিদেশীয় ভাষার রীতি নিবেশিত করিয়া আমাদের বাঙ্গালা ভাষার কতদূর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গেলেন ও ভাবী উন্নতির কিরূপ সূত্রপাত করিলেন।

এক্ষণে পাঠকবর্গের সন্তোষার্থ অলঙ্কারের স্বরূপ নিরূপণ, কতিপয় প্রসিদ্ধ অলঙ্কারের লক্ষণ নির্দ্দেশ ও মেঘনাদ হইতে সেই সেই অলঙ্কারের উদাহরণ সঙ্কলন করা যাইতেছে।

যদ্দ্বারা শব্দার্থের বৈচিত্র্যসাধন ও বাক্যরসের পুষ্টি সম্পাদন হয়, তাহার নাম অলঙ্কার। বালা, হার প্রভৃতি লৌকিক অলঙ্কার যেরূপ শরীরের, প্রস্তাবিত অলঙ্কারও সেইরূপ শব্দার্থের শোভা

সম্পাদন করে। কিন্তু যেমন মানব শরীরে সর্ব্বদা ভূষণ দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ শব্দার্থেও সকল সময়ে অলঙ্কার বিদ্যমান থাকে না। সময়ে সময়ে শব্দার্থে অলঙ্কারের অসদ্ভাবও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা অলঙ্কারকে শব্দার্থের অচিরস্থায়ী ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অলঙ্কারের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল, উহা সকল ভাষাতেই একরূপ, কুত্রাপি উহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না।

আলঙ্কারিকেরা অলঙ্কারকে দুই ভাগে বিভাজিত করিয়াছেন। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। বাঙ্গালা-ভাষায় যে সমস্ত শব্দালঙ্কার প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে অনুপ্রাস ও যমক প্রধান।

অনুপ্রাস। (Alliteration)

যে স্থলে দুই বা ততোঽধিক ব্যঞ্জন বর্ণের সাদৃশ্য থাকে, তথায় অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। অনুপ্রাসস্থলে স্বরবর্ণের সাদৃশ্য না থাকিলেও কোন হানি নাই। অনুপ্রাস গদ্য ও পদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"———হায় রে, কেমনে,
ভব ভবনের কবি বর্ণিবে বিভব ?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে !"

এই অনুপ্রাসঅলঙ্কার আধুনিক কবিগণের অতিশয় প্রিয়, কিন্তু প্রাচীন কবিরা তাদৃশ অনুপ্রাস-

প্রিয় ছিলেন না। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, যে অনুপ্রাস অলঙ্কারের দ্বারা যেরূপ শব্দের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, সেইরূপ উহার আতিশয্যে শব্দের মাধুর্য্য না জন্মিয়া বরং কার্কশ্যই জন্মে।

যমক। (Analogy)

ভিন্নার্থ বাচক সমাকার শব্দ একত্র বিন্যস্ত হইলে যমক অলঙ্কার হয়।

" বীর বেশে বিভীষণ বিভীষণ রণে, "

" শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে, "

প্রথম উদাহরণে প্রথমোক্ত বিভীষণ শব্দে রাবণানুজ ও শেষোক্ত বিভীষণ শব্দে ভয়ানক। দ্বিতীয় উদাহরণে প্রথমোক্ত শত্রুঘ্ন শব্দে লক্ষ্মণানুজ ও শেষোক্ত শত্রুঘ্ন শব্দে শত্রুনাশক প্রতীয়মান হইতেছে।

এই যমক অলঙ্কার কি বাঙ্গালা কি সংস্কৃত ভাষায় এরূপ মধুর, যে কবিগণ অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ভিন্নার্থ বাচক একাকার শব্দ বারংবার প্রয়োগ করিয়া থাকেন; সুতরাং সর্ব্বত্র যমকালঙ্কার যুক্ত পদের সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃত ভাষার কোন কোন মহাকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কবিগণ এক একটী যমকালঙ্কার যুক্ত পদের অনুরোধে এক একটী শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সেই

শ্লোকের সেই সেই অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশে চমৎকারিতা দৃষ্ট হয় না।

অর্থালঙ্কারের বিষয় লিখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উপমা অলঙ্কারের লক্ষণ নিরূপণ ও উদাহরণ সংকলন করা উচিত। কেননা সাদৃশ্য মূলক যত অলঙ্কার আছে, তন্মধ্যে উপমা অলঙ্কারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

উপমা। (Simile)

যে স্থলে যথা ও যেমতি প্রভৃতি সাদৃশ্য বাচক শব্দদ্বারা দুই বিষয়ে সমান ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা যায়, তথায় উপমা অলঙ্কার হইয়া থাকে।

" দ্বিরদ রদ নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেনকালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রু বিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল দলে, "
উদয় অচলে ভানু দিলে দরশন——

এই উদাহরণে যথা শব্দদ্বারা মধুসখা কন্দর্পের সহিত ভানুর, শিশির বিন্দুর সহিত অশ্রু বিন্দুর ও

নয়নের সহিত শতদল দলের * উপমান ও উপমেয়-ভাব স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে।

মালোপমা।

অনেকগুলি উপমা একত্র থাকিলে মলোপমা হয়।

হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীর পুত্র ধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীর শূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফল শূন্য বনস্থলী, জল শূন্য নদী!———

নিরন্তর কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় পড়িতে হইলে পাঠকের বিরক্তি জন্মে; এই নিমিত্ত কাব্যকারেরা উপমা প্রয়োগদ্বারা পাঠকের অন্তঃকরণকে নূতন নূতন মনোহর বিষয়ের প্রতি ধাবমান করিয়া থাকেন, নতুবা কেবল বর্ণনা উজ্জ্বল করা উপমা প্রয়োগের উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষীয় কবিগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কালিদাস উপমা প্রয়োগ বিষয়ে অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোন দেশের কোন কবি উপমা প্রয়োগ বিষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ নহেন। সে যাহা হউক, মেঘনাদ আদ্যোপান্ত

---

* যাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায় তাহাকে উপমান, আর যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয় কহে।

পড়িলে গ্রন্থকারকে অতিশয় উপমাপ্রিয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তিনি অনেকস্থলে এরূপ পদার্থ লইয়া উপমা সংকলন করিয়াছেন, যেগুলি প্রতি দিবস আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে স্থতরাং সেই সেই স্থল পড়িবার সময়ে উপমা ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য অনায়াসেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। কিন্তু উপমা প্রয়োগবিষয়ে তাঁহার একটী দোষও লক্ষিত হয়। তিনি উপর্য্যুপরি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন ও কোন কোন স্থলে উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগীও হয় নাই। নিম্নে উদ্ধৃত উদাহরণ দেখিলে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

সীতা, সরমার সহিত কথোপকথন সময়ে কহিতেছেন।

“ আগম, পুরাণ বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে
শুনিতাম সেইরূপে আমিও রূপসি নানা কথা ”

এই উদাহরণে পঞ্চমুখ মহাদেব, পঞ্চমুখে উমারে যেরূপ আগম ও পুরাণ প্রভৃতি কহেন, আমিও সেইরূপ স্বামীর মুখে নানা কথা শুনিতাম। এস্থলে উপমার ক্রিয়াগত দোষ স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। ফলতঃ উপর্য্যুপরি উপমা প্রয়োগ ও দুই এক স্থলে উপমার সহিত উপমিত বিষয়ের অনুপযোগিতা

মেঘনাদকারের একটী দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বহুগুণের স্থলে উক্ত প্রকার দুই একটী ক্ষুদ্র দোষ গ্রহণীয় নহে, ইহা আমি ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অনবধানতা অথবা মানব প্রকৃতির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ঘটিতেই পারে। কোন একটী বৃহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি রাখা মানব প্রকৃতির সাধ্য নহে। এই নিমিত্ত ভবভূতি, মিল্টন ও সেক্‌স পিয়ার প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মহাকবিগণের কাব্যেও দুই একটী ক্ষুদ্র দোষ লক্ষিত হয় ও এই নিমিত্তই ইউরোপের প্রাচীনকালের সরলহৃদয় সমালোচকেরা উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণেতাগণের উক্ত প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ পরিহারার্থ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সেই দোষাশ্রিত শব্দ প্রয়োগকে সেই সেই অলঙ্কারের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

উৎপ্রেক্ষা। (Hypothetical metaphor)

যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয় অধঃকৃত করিয়া তাহার সহিত অপর বিষয়ের অভেদ কল্পনা করা যায়, তথায় উৎপ্রেক্ষা নামক অলঙ্কার হয়। সংস্কৃত-আলঙ্কারিকেরা সামান্যতঃ এই অলঙ্কারের দ্বিবিধ ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। বুঝি, যেন প্রভৃতি উৎ-

প্রেক্ষাবাচক শব্দের প্রয়োগ থাকিলে বাচ্যা, আর না থাকিলে প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা হয়।

কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোটা ভালে, ফুল মাল্য গলে
পুড়ে ধূপদানে ধূপ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃত রসে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষ নাশিনী
তুমি! পাশে হেম ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেমপাত্রে; রুদ্ধদ্বার; —বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন —

এই উদাহরণে ইন্দ্রজিতের বর্ণনা করা কাব্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য। চন্দ্রচূড় বর্ণনীয় নহেন, অথচ ইন্দ্রজিতকে অধঃকৃত করিয়া তাঁহার সহিত চন্দ্রচূড়ের অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে এবং যেন শব্দ দ্বারা ঐ অভেদ কল্পনা সুব্যক্ত হইতেছে।

"———কুসুমেষু বসি কুতুহলে,
হানিলা, কুসুমধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল; — প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী।
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু!

এই উদাহরণে যেন শব্দের প্রতীতি হইতেছে অতএব এস্থলে প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা হইল।

রূপক। (Metaphor)

বর্ণনীয় বিষয়ে বিষয়ান্তর আরোপ করিলে রূপক হয়। রূপক অলঙ্কারের স্থলে সচরাচর রূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন রূপ শব্দের লোপ হইয়া যায়। তখন ভাবার্থের দ্বারা রূপ শব্দের প্রতীতি জন্মে।

"——শোকের ঝড় বহিল সভাতে!"
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার; জীমূত মন্দ্র হাহাকার রব!

এই উদাহরণে চিত্রাঙ্গদার শোক বর্ণনীয়। ঐ বর্ণনীয় বিষয়ে ঝড়ের আরোপ করা হইয়াছে এবং ঐ আরোপ সিদ্ধির নিমিত্ত বামাকুলে সুর সুন্দরীর (বিদ্যুতের) আরোপ, কেশে মেঘমালার, নিশ্বাসে প্রলয় বায়ুর, অশ্রুধারাতে আসারের আরোপ করা হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত। (Parallel)

সাদৃশ্য বাচক যথা যেমতি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ না করিয়া ও একরূপ সাধারণ ধর্ম্ম না দেখাইয়া

সমভাবাপন্ন দুই বস্তুর সাদৃশ্য প্রতিপাদন করিলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়।

"——হে রক্ষো রথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহা কুলে?
কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ কাননে;
যায় কিসে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,——

এই উদাহরণে যথা যেমতি প্রভৃতি সাদৃশ্য বাচক কোন শব্দই নাই অথচ রক্ষোরথিবিভীষণ ও রাজহংস এই উভয়ের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হইতেছে। বিভীষণের রামপক্ষে পক্ষপাত ও রাজহংসের পঙ্কিল সরোবরে গমন এই উভয় ধর্ম্মও একরূপ নহে। অতএব ঐ স্থলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কারই স্থির হইল।

তুল্য যোগিতা। (Identity of Attribute)

অনেক পদার্থের এক গুণ ও এক ক্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ থাকিলে তুল্য যোগিতা হয়।

"——চমকিলা দিবে,
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।

এই উদাহরণে "চমকিলা" এই ক্রিয়া পদটীর সহিত অনেক পদার্থের অন্বয় স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে।

নিদর্শনা। Transference of Attributes)

সাদৃশ্য বশতঃ কাহার উপরে কোন অবাস্তবিক

ধর্ম্ম অথবা কার্য্য আরোপ করাকে নিদর্শনা কহে।

নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমর বৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুল দল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?———

এই উদাহরণে বিধাতা বস্তুতঃ ফুলদল দ্বারা শাল্মলী তরুর ছেদন করেন নাই; অথচ তিনি করিয়াছেন বলিয়া নির্দেশ আছে। অতএব একের উপর অযথার্থ কার্য্য আরোপিত হইল এবং উহা সাদৃশ্য হেতুকও বটে, যেহেতুক ভিখারি রাঘব কর্ত্তৃক তাদৃশ ভুজবীর্য্যশালী ধনুর্দ্ধরের নিহনন ফুলদল-দ্বারা শাল্মলীতরুর ছেদনের ন্যায়, এইরূপ সাদৃশ্য প্রতীত হইতেছে।

দীপক। (Identity of Action or Agent)

যে স্থলে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত এই উভয় বিষয়ের এক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় অথবা যে স্থলে অনেক ক্রিয়ার একমাত্র কর্ত্তা নির্দ্দেশিত হয়, তথায় দীপক নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে।

——"হায়, সখি কেমনে বর্ণিব

সে কান্তার কান্তি আমি? * * *
অজিন (রঞ্জিত আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় কভুবা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,——

এই উদাহরণে "আমি" এই কর্ত্তা কারকের সহিত সকল ক্রিয়ার সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে।

অর্থান্তরন্যাস। (Corroboration)

সামান্য অর্থের দ্বারা বিশেষ অর্থের ও বিশেষ অর্থের দ্বারা সামান্য অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করিলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়।

——"হেন সহবাসে
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেননা শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্ম্মতি।

এই উদাহরণে "নীচ সহবাসে মতি-ভ্রংশ হয়" এই সামান্য অর্থের দ্বারা বিভীষণের বর্ব্বরতা শিক্ষা-রূপ বিশেষ অর্থ সমর্থিত হইতেছে।

অতিশয়োক্তি। (Hyperbole)

উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকে উপমেয় রূপে নির্দেশ করিলে অতিশয়োক্তি হয়।

যেওরবির ছবি প্যানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি!

এই উদাহরণে উপমেয় মেঘনাদের উল্লেখ নাই, কিন্তু ঐ স্থলে উপমানভূত রবিকে উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

ব্যতিরেক। (Excess of object and Subject)

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ বুঝাইলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।

——————"শোভিছে

পতাকা; রবি পরিধি জিনি তেজোগুণে,

এই উদাহরণে উপমান রবিপরিধি অপেক্ষা উপমেয় ভূত পতাকার উৎকর্ষ স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে।

সমাসোক্তি। (Personification)

বর্ণনীয় বিষয়ে, কার্য্য, লিঙ্গ অথবা বিশেষণের সমতা জন্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ান্তরের আরোপ করাকে সমাসোক্তি কহে।

——————"নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে, রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি সতি।
রক্ষঃকুল রবি ওই উদয় অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ বিভাবরী!

এই উদাহরণে স্ত্রীলিঙ্গ বশতঃ রাক্ষস পুরীতে নায়িকার ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে।

কাব্যলিঙ্গ। (Implied causality)

এক বাক্য অপর বাক্যের অথবা এক পদার্থ অপর পদার্থের হেতু হইলে কাব্যলিঙ্গ হয়।

——হায়, তাত, উচিত কি তব
একাজ, নিকষা সতী তোমার জননী
সহোদর রক্ষঃ শ্রেষ্ঠ? শূলী শম্ভু নিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?

এই উদাহরণে শেষোক্ত বাক্যগুলি প্রথমোক্ত বাক্যার্থটীর (তোমার একাজ করা উচিত নহে) হেতু হইয়াছে। অতএব ঐ স্থলে কাব্যলিঙ্গই স্থির হইল।

যে সকল অলঙ্কারের বিষয় উল্লিখিত হইল, মেঘনাদে তদ্ব্যতিরিক্ত অনেক অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না।

সম্প্রতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি সহকারে সূর্য্য-মণ্ডলের উপরিভাগে অনেক কলঙ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ কলঙ্কগুলির মধ্যে কোন কোনটী সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় ও কোন কোনটী অপ্রকাশ ভাবে অব-

স্থিতি করে, সহসা সে সকল কলঙ্কের উপলব্ধি হয় না। পরন্তু সূর্য্যমণ্ডলের আলোকময় অংশের কোন কোন অবয়ব সমধিক উজ্জ্বল ও কোন কোন স্থান বা কিঞ্চিৎ মলিন দেখায়। সেইরূপ মেঘনাদ-বধ কাব্য যদিও সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য পরম্পরাতে পরিপূর্ণ; তথাপি উহার কোন কোন স্থলের সৌন্দর্য্য আমার সমধিক চমৎকারী ও হৃদয়গ্রাহী বোধ হইতেছে। অতএব এক্ষণে আমি সেই স্থলগুলি ক্রমশঃ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রন্থকার, বীরবাহুর পতন হইতে কাব্য আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বলিবার অব্যবহিত পরেই সুকবি জনোচিত সৌজন্যপূর্ণ বাক্যে সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দ মতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যে মতি মাতঃ বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চ বধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভব মণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে

চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্য রত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,
সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে ?
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?
কিন্তু যেগো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে ! গাইব মা, বীর রসে ভাসি,
মহাগীত ; উরিদাসে দেহ পদছায়া।

বাঙ্গালা ভাষায় কোন কাব্যেই এরূপ সুন্দর ও অলঙ্কার ভূষিত সরস্বতী বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রথমতঃ কাব্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ, তৎপরে সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণনার্থ ঐরূপে সরস্বতীর বন্দনা ও তাঁহার নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা গ্রন্থকারের পক্ষে যে কিরূপ ন্যায়ানুগত হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

প্রথমসর্গে গ্রন্থকার রাবণের যে সভা বর্ণন করিয়াছেন, সেটী উন্নত, সাড়ম্বর ও অলঙ্কার ভূষিত

হইয়াছে। কোন রাজাধিরাজের সভার শোভা বর্ণন করিতে হইলে বোধ হয়, উহা অপেক্ষা মনোহর করা সুকঠিন।

লঙ্কেশ্বর সমুদ্রোপরি সেতু দর্শন করিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিতেছেন,

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হাধিক্ ওহে জলদল পতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর?——

এই বর্ণনাটীও চমৎকার হইয়াছে। বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর পদ্যে এরূপ মনোহারিণী রচনা হইতে পারে বোধ হয়, ইহা কেহ স্বপ্নেও জানিতেন না। এ স্থলে এ কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে, যে পয়ারাদি ছন্দ ক্রমাগত পড়িতে হইলে পাঠকের মনে বিরক্তি জন্মে; সুতরাং অধিকক্ষণ পড়িতে ভাল লাগে না। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই একটী চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়, যে উহা যতক্ষণ পাঠ কর, বিরক্তি না জন্মিয়া বরং উত্তরোত্তর পাঠ লালসা উদ্দীপ্ত হইতে থাকে।

প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদা পুত্রশোকে কাতরা হইয়া লঙ্কেশ্বরের নিকটে যে বিলাপ করেন, সেই বিলাপ

বাক্যগুলি অতি সরল ভাষায় সুন্দর রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকমাত্রই তৎপাঠে পরম প্রীতিলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী ! কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি
রাজ কুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?

লঙ্কেশ্বর, চিত্রাঙ্গদার ঐরূপ আক্ষেপোক্তি শ্রবণে এই বলিয়া তাঁহার শোকাপনোদন করিবার চেষ্টা পান, "যে তুমি বীর মাতা, তোমার পুত্র সম্মুখ-সমরে দেশবৈরি নাশ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, অতএব তাহার নিমিত্ত তোমার কি এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করা উচিত হয় ? ঐ সময়ে চিত্রাঙ্গদা উহার যে একটী উত্তর প্রদান করেন, সেটীও অধিকতর প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে।

উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা;—দেশবৈরি নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যা পুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এদেশে
রাঘব? এ স্বর্ণ লঙ্কা দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত,
অতুল ভব মণ্ডলে; ইহার চৌদিকে
রজত প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযুতীরে বসতি তাহার
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম সিংহাসন—আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশ রিপু
কেন তারে বল বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কেহ, একাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যা বর্ণনটী অতি মনো-
হর হইয়াছে। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক

বোধ হইতেছে, যে বীররসাশ্রিত কাব্যে সন্ধ্যা ও প্রভাত প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণন অনুচিত। করিলে প্রায় তাহার সৌন্দর্য্য থাকে না। এই নিমিত্ত শিশুপাল বধ কাব্যের প্রণেতা মাঘ নামক কবির উক্ত প্রকার বিষয়ের বহু বিস্তৃত বর্ণনা দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ও এই নিমিত্ত ইউরোপের প্রাচীনকালের সমালোচকেরা বীর রসাশ্রিত কাব্যে ঐ সকল বিষয়ের দীর্ঘ বর্ণনা দোষাস্পদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মেঘনাদকার উক্ত প্রকার বিষয়ের বর্ণন স্থলে সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিযা সে দোষটীর পরিহার করিয়াছেন।

যৎকালে ইন্দ্রজিৎ বৈরি ইন্দ্র, কৈলাসধামে ভগবতীর স্তব করিতেছিলেন, ঐ সময়ে রামচন্দ্র লঙ্কাধামে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক ভগবতীর পূজা আরম্ভ করেন। সহসা কৈলাসপুরী গন্ধামোদে পরিপূরিত ও শংখ ঘণ্টার শব্দে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় ভগবতী বিজয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন।

———“বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ ভবানী
সুধিলা; “ লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পুজিছে অকালে ?
　মন্ত্র পড়ি, খড়ি, পাতি, গণিয়া গণনে,

নিবেদিলা হাসি সখী; হে নগ নন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে
বারি সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গগনে।
অভয় প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিণি!

এই কএক পঁক্তি সরল ও নিরলঙ্কার মাধুরীতে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইতেছে।

প্রথম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে, মেঘনাদ ভ্রাতৃ বধের বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রমোদ উদ্যান হইতে লঙ্কায় গমন করেন। তিনি প্রস্থান সময়ে স্বীয় সহধর্ম্মিণী প্রমীলার নিকটে শীঘ্র ফিরিয়া আসিব বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন, কিন্তু লঙ্কায় যাইবার পরে লঙ্কেশ্বর তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করেন; সুতরাং তিনি ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। এখানে প্রমীলা পতি দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া সহচরী বাসন্তীর নিকটে লঙ্কায় যাইবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে বাসন্তী কহেন, বিপক্ষসেনা কর্ত্তৃক লঙ্কা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। তুমি তথায় কিরূপে প্রবেশ করিবে? সখীর এই বাক্যে প্রমীলা রোষ পরবশা হইয়া কহিতেছেন।

"কি কহিলি বাসন্তী? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব নন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"

এই স্থলটী যেরূপ ওজস্বী সেইরূপ মধুরও হইয়াছে। এই কএক পঁক্তি পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক মাত্রকেই প্রীত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

তৃতীয়সর্গের যে স্থলে প্রমীলার রণসজ্জা, সহচরী-সমভিব্যাহারে প্রমোদ উদ্যান হইতে লঙ্কাধামে যাত্রা, হনুমানের সহিত কথোপকথন, প্রমীলার রূপ লাবণ্য দর্শনে হনুমানের বিস্ময়োক্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থল অতীব রমণীয়।

সংস্কৃত-আলঙ্কারিকেরা কহেন, স্ত্রী জাতিতে বীর রস বর্ণন করা অনুচিত। বর্ণন করিলে প্রকৃত রস না হইয়া রসাভাস হয়; সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রমীলার রণসজ্জা বর্ণনটী রসাভাসেরই উদাহরণ হইতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া ঐ স্থলটীর রমণীয়তা, গুণগ্রাহীগণের সহৃদয়তার নিকটে অনাদৃত হইতে

পারে না। যাঁহারা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের একান্ত পক্ষপাতী, যাঁহারা উহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর বিন্দু বিসর্গও অতিক্রম করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে অপ্রতিভ করিবার নিমিত্তই যেন মেঘনাদকার স্বপ্রণীত মহাকাব্যের নায়িকাকে প্রমীলা নাম প্রদান করিয়াছেন। কারণ কবিগুরু বেদব্যাস মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে ঐ নামধেয়া কোন কামিনীকে বীর রসের উপযোগিনী করিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অতএব যদি স্ত্রী জাতিতে বীররসের বর্ণনা করা অনুচিত হয়; তবে সে দোষটী মেঘনাদকারের অপেক্ষা কবিগুরু বেদব্যাসের অধিক হইয়াছে বলিতে হইবে। যেহেতুক বেদব্যাসের প্রমীলা মানুষী কিন্তু মেঘনাদকারের প্রমীলা দানবী ও রক্ষঃবধূ।

চতুর্থসর্গে সরমার সহিত সীতার কথোপকথন বর্ণনটী আদ্যোপান্ত সুন্দর হইয়াছে। আমি এ স্থলে উহার কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী

সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ বিহারিণী!

এই স্থলটী স্বভাব বর্ণনায় অলঙ্কৃত। গ্রন্থকার ঐ স্থলে বন্দীকৃত জনের মনের ভাব অবিকল বর্ণনা করিয়াছেন।

সীতার আক্ষেপোক্তি শ্রবণে সরমা কাতরা হইয়া প্রথমতঃ বিলাপ করেন। তৎপরে তাঁহাকে এইরূপে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন, দেবি! আপনার দুঃখ সর্ব্বরী প্রভাতপ্রায় হইয়াছে, আপনার স্বপ্ন বৃত্তান্ত মিথ্যা হইবার নহে। আপনি অচিরাৎ স্বামীর সাক্ষাৎকারলাভ করিবেন, কিন্তু তখন এ অধিনীকে ভুলিবেন না। সীতা, সরমার এইরূপ সৌজন্যপূর্ণ সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন।

——————————কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কিলো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম; ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!

আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"

এই কএক পঁক্তি সরল, সুললিত ও অলঙ্কার ভূষিত দৃষ্ট হইতেছে।

পঞ্চমসর্গের যে স্থলে প্রমীলা পতির ভাবি বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত ভগবতীর আরাধনা করিতেছেন সে স্থলটী এরূপ রমণীয় হইয়াছে, যে আমি তাহার উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না।

এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি;
প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপাদৃষ্টি কর লঙ্কা পানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য কবচ রূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরু রাজে!
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?

শব্দবহ আকাশ কর্ত্তৃক প্রমীলার ঐ স্তুতিবা কৈলাসধামে নীত হইলে ইন্দ্র ভয়ে কম্পিত কলেব

হইলেন। তদ্দর্শনে বায়ুপতি তৎক্ষণাৎ উহাকে দূরে উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু স্থলান্তরে দৃষ্ট হইবে, যৎকালে রামচন্দ্র ভগবতীর আরাধনা করেন, শব্দবহ আকাশ কর্ত্তৃক ঐ আরাধনা কৈলাসধামে নীত হইবা-মাত্র বায়ু অনুকূল হইয়া উহাকে ভগবতীর অভিমুখে চালিত করেন ও ইন্দ্র আনন্দিত হন। কবি এই বিষয়টী বর্ণনকালে স্বীয় অসাধারণ রচনা কৌশলের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

ষষ্ঠসর্গে যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের প্রতি মেঘনাদের তিরস্কার, বিভীষণের সহিত মেঘনাদের কথোপকথন, মেঘনাদের পতনের অব্যবহিত পরেই বিভীষণের বিলাপ বর্ণন, কবিত্বশক্তি-ভূষিত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থলের সৌন্দর্য্য এত সুস্পষ্ট, যে সামান্য পাঠকেরাও অনায়াসে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

সপ্তমসর্গের প্রারম্ভে প্রভাত বর্ণনটী অতিশয় মনোহর হইয়াছে। পাঠকালে উহার প্রতিপদেই যেন প্রকৃতি মুর্ত্তিমতী হইয়া আমাদের আনন্দ বিধান করিতে থাকেন।

ষষ্ঠসর্গে বর্ণিত হইয়াছে লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবিষ্ট হইয়া দেবদত্ত অস্ত্রের দ্বারা রাত্রিকালে মেঘনাদের প্রাণ সংহার করেন। পর দিবস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঐ অশুভ সংবাদ প্রমীলার কর্ণগোচর হয় না, তিনি

সহসা দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত দর্শনে বিস্মিত হইয়া সহচরী বাসন্তীকে যে সকল কথা কহিতেছেন, সে গুলি পতি পরায়ণা কামিনীর অনুরূপ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

————————সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্ত সৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী
কহিলা,—কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁকি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে,
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে
অনুরোধে দাসী তাঁর, ধরি পা দুখানি!"

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কহেন, সদ্‌গুণ সম্পন্না কামিনীকে কাব্যের নায়িকা করা উচিত। মেঘনাদ-কার তাঁহাদের ঐ উপদেশের নিদেশবর্ত্তী হইয়াই চলিয়াছেন। কামিনীকুলের পতিভক্তিই প্রধান গুণ সন্দেহ নাই। মেঘনাদ কাব্যের নায়িকা প্রমীলার সেই সদ্‌গুণটী বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এদিকে কৈলাসধামে ভক্তবৎসল মহাদেব মেঘনাদের নিধন জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া ভগবতীকে কহিতেছেন, দেবি! তোমার অনুরোধে আমি বাসবের বাসনা পূর্ণ করিলাম। এক্ষণে অনুমতি কর, আমি একবার দশাননের সন্তোষ বিধান করি এতদুত্তরে ভগবতী কহিতেছেন।

উত্তরিলা কাত্যায়নী, যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী;
এ কথাটী বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে!
আর কি কহিবে দাসী ওপদ রাজীবে?

এই স্থলটী অতিশয় প্রসাদগুণ সম্পন্ন হইয়াছে। আবৃত্তি মাত্রেই উহার অর্থগুলি স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। গ্রন্থকার এস্থলে কবিকুলগুরু বাল্মীকির রচনা প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন।

সপ্তমসর্গে উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জা, সৈন্যপ্রয়াণ ও সংগ্রাম বর্ণন অতীব রমণীয় হইয়াছে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, যে গ্রন্থকার দানবনাশিনী চণ্ডীর সহিত রাক্ষসসেনার যেরূপে উপমা দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া দেখিলে গ্রন্থকারের কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে

পারা যায় না। তিনি রাক্ষসসেনার রণসজ্জা অবধি রণ ক্ষেত্র হইতে লঙ্কায় প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ঐ উপমাটী অক্ষত রাখিয়াছেন।

* যথা দেব তেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনিকিনী-উগ্রচণ্ডা রণে
গজরাজ তেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী, তুরী, দুন্দভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাঠি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গার,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !
——পশিলা পুরে রক্ষঃ অনীকিনী
রণ বিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধারে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্র দেহ !——*

গ্রন্থকার মার্কণ্ডেয় পুরাণকে আদর্শ করিয়া ঐ উপমাটীর সংকলন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব যাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যথার্থ ভক্তি

আছে, তাঁহারা ঐ স্থলটী পাঠ করিয়া অধিকতর প্রীত ও চমৎকৃত হইবেন।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘু-রাজার দিগ্‌বিজয় বর্ণনস্থলে লিখিয়াছেন, অগ্রে প্রতাপ, তৎপশ্চাৎ শব্দ তদনন্তর সৈন্য রেণু চলিতে লাগিল। মেঘনাদকার রাক্ষসসেনার যুদ্ধ প্রয়াণ বর্ণন করিবার সময়ে কালিদাসের ঐ বর্ণনাটীর সুন্দররূপে অনুকরণ করিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠ-কেরা ঐ স্থলটী পাঠ করিয়া অধিকতর প্রীতিলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিয়ি;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকার রূপে!——

সপ্তম সর্গের যেস্থলে পৃথিবী, রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত দশাননের রণসজ্জা দর্শনে ভীতা হইয়া নারায়ণের স্তব করিতেছেন, ঐ অংশের রচনা সমধিক চমৎ-কারিণী ও চিত্তহারিণী হইয়াছে। গ্রন্থকার ঐ স্থলে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কবিবর জয়দেবের দশাবতার বর্ণন * হইতে ভাব সংকলন করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

---

* বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোল মুদ্বিভ্রতে

মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে;—
বারে বারে অধিনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহুমূর্ত্তি ধরি;
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে; বিরাজিনু দশন শিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা
সদৃশী) বরাহ মূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু! নরসিংহ বেশে বিনাশিয়া
হিরণ্য কশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে!
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকার ছলে,
বামন! বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে!
আর কি কহিব নাথ? পদাশ্রিতা দাসী!
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তি কালে।

কেহ কেহ কহেন, মেঘনাদকার, কালিদাস ও হোমার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় প্রাচীন কবিগণের মহাকাব্য হইতে অনেক ভাব সংকলন করিয়াছেন,

---

দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্য মাতন্বতে ম্লেচ্ছান্ মুর্চ্ছয়তে দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।

তাঁহার নিজের কবিত্বশক্তি বড় অধিক দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের এই বাক্যটী যে ভ্রমাত্মক ও অজ্ঞানতা-মূলক তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুবিচক্ষণ পাঠকেরা বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন, যে প্রকৃতি ও অবস্থার বর্ণনাকরাই কবিগণের কার্য্য। প্রকৃতি ও অবস্থা চিরকাল একরূপ থাকে। কস্মিনকালেও উহার পরিবর্ত্ত হয় না। অতএব এরূপ স্থলে আধুনিক কবিদিগকে প্রাচীন কবিগণের বর্ণনার অনুকরণ করিতেই হইবে। এই নিমিত্ত মিণ্টন, স্বরচিত মহাকাব্যের অনেকস্থলে প্রাচীন কবি হোমারকৃত ইলিয়ড হইতে অনেক ভাব সংকলন করিয়াছেন ও কোন কোন স্থলে ইলিয়ড হইতে অবিকল অনুবাদ করিয়াও দিয়াছেন ও এই নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য শিশুপাল বধের কোন কোন স্থলে ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ের ভাব ভিন্ন ছন্দে অবিকল বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি মাঘপ্রণীত শিশুপালবধ কাব্য ভারতবর্ষে যে কিরূপ সমাদৃত হইয়া থাকে, তাহা মাঘে সন্তি এয়োগুণা কাব্যেষু মাঘ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উক্তি দ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। কিন্তু মাঘ কবি, কিরাতার্জ্জুনীয়কে যেরূপ আদর্শ করিয়া শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন, মেঘনাদকার কি হোমার, কি মিণ্টন, কি ডান্টি

কোন কবিকেই সেরূপ আদর্শ করেন নাই। অতএব এমত স্থলে মেঘনাদকারকে ভাবচোর বলিয়া তাঁহার কবি কীর্ত্তি লোপের চেষ্টা করা নিতান্ত অবিমৃষ্য-কারিতা ও মৎসরতার কার্য্য বই আর কি বলা যাইতে পারে।

কবিকুলগুরু বাল্মীকি রাম রাবণের যুদ্ধের উপমাস্থল না পাইয়া বলিয়া গিয়াছেন, "রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধ রামরাবণয়োরিব।" মেঘনাদকার সপ্তম সর্গে যুদ্ধটী এরূপ ভয়ঙ্কর করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যে তাহা পড়িলে বাল্মীকির ঐ বাক্যটী আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। ফলতঃ তাদৃশ অশ্রুত পূর্ব্ব ভয়ানক সংগ্রামের বর্ণন করিতে হইলে সিংহনাদ, টঙ্কটঙ্কার, ঘনঘটা গর্জ্জনের ন্যায় রথচক্রের গভীর ঘর্ঘরধ্বনি, সেনাগণের ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে ভূধরের অধীরতা ও ভূকম্পন প্রভৃতি যে সমস্ত ভয়াবহ পদার্থের উল্লেখ করা আবশ্যক, তৎসমুদায়ই উহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অষ্টম সর্গে যমপুরী বর্ণনটী অতি সুন্দর হইয়াছে। কবি উহার অনেক স্থলে এরূপ অনেক ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে সেগুলি পড়িবার সময়ে আমাদের মনে উদয় হয়, যেন গ্রন্থকার যমপুরীর ভীষণমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া আমাদের সম্মুখে স্থাপিত করিলেন।

নবম সর্গের যেস্থলে প্রমীলা সহমরণে উদ্যত হইয়া স্বামীর চিতায় আরূঢ়া হন ও শোকাকুল লঙ্কেশ্বর নিকটে যাইয়া পরিদেবিত-পরিপূর্ণ আত্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করেন, ঐ অংশের রচনা এরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে, যে তৎপাঠে পাঠকমাত্রেরই অন্তঃকরণ করুণরসে আর্দ্র হয়।

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে
ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুল রাজ সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বরি-গৌরবরবি চির রাহু গ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায়রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনা ছলে

সান্ত্বনিব, মায়ে তব, কে কবে আমারে?
কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার? সুধিবে
যবে রানী মন্দোদরী,—কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?
কি কয়ে বুঝাব তারে?———

—•❋❋•❋•—

উপসংহার।

আমি মেঘনাদ কাব্যের চমৎকারিতা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রথমতঃ উহার উপাখ্যান, ভাব ও রচনা প্রভৃতির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি তৎপরে উহার প্রতি সর্গের কোন কোন স্থল উদ্ধৃত এবং সেই সেই স্থলের রমণীয়তা প্রতিপাদিত করিবার চেষ্টা পাইলাম। কিন্তু তথাপি এই গুরুতর প্রস্তাবের যেরূপে সংকলন করা উচিত, সেরূপ করিতে পারিলাম না। আমি নিঃশংসয়ে বলিতে পারি, যদি কেহ উত্তরকালে মেঘনাদের সমালোচন করেন, তাহা হইলে তিনি উহার অনেক স্থলে এরূপ অনেক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন যেগুলির বিষয় আমি উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

মেঘনাদ বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত হইয়াও সর্ব্বথা দোষশূন্য নহে। মেঘনাদের দুই এক স্থলে গ্রাম্যতা ও স্থলবিশেষে ক্লিষ্টতা প্রভৃতি কএকটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ইতিপূর্ব্বেই ঐরূপ দোষ ঘটিবার অপরিহার্য্য কারণ প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই, যে উক্ত প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ সত্বেও মেঘনাদ বাঙ্গালা ভাষার যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য তাহার সন্দেহ নাই। অস্মদ্দেশীয় সুবিচক্ষণ গুণগ্রাহী পাঠকেরাও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন ও কেহ কেহ মেঘনাদকারকে, বিদ্যাসুন্দর প্রণেতা ভারতচন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণনা করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না। আমি তাঁহাদের এই প্রশংসাবাদ অত্যুক্তি বলিতে পারি না। মেঘনাদ সম্পূর্ণরূপে ঐরূপ প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই।

এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই স্বসমকালে সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই। যে মিল্টন এক্ষণে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, সভ্যদেশমাত্রেই যাঁহার নাম অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পুর্ব্বে সেই মিল্টনেরও অসাধারণ কবিত্বশক্তি বিশ্বজনীনরূপে অঙ্গীকৃত হয় নাই।

যে ভবভূতি এক্ষণে ভুবন বিখ্যাত হইয়াছেন, ইউ-রোপীয় পণ্ডিতেরা প্রকৃতি বর্ণনা ও অশ্লীল ভাবের পরিহার জন্য যাঁহাকে কবিকেশরী কালিদাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, সেই ভবভূতিও স্বসমকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না। তিনি স্বরচিত মালতী মাধবের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, (যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং জানন্তি তে কিমপি তান্‌প্রতি নৈষ যত্নঃ উৎপৎস্যতে অস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলাচ পৃথ্বী) যাহারা আমার এই নাটকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে, তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়; আমার কাব্যের ভাব গ্রহণে সমর্থ কোন ব্যক্তি এই অসীম ভূমণ্ডলের কোন স্থানে থাকিতে পারেন অথবা কোনকালে জন্মগ্রহণ করিবেন।

ভবভূতির ঐ শ্লোকটী পড়িয়া দেখিলে কখনই এরূপ বোধ হয় না, যে তিনি জীবিতকালে যশোলাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ স্বসমকালে সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ অনেক কবির অদৃষ্টেই ঘটিয়া উঠেনা। তাঁহাদের কাব্যের গুণ ভবিষ্যতের তিমিরময় গর্ভেই নিহিত থাকে। কিন্তু মেঘনাদ-রচয়িতার বিষয়ে সেরূপ দৃষ্ট হইতেছেনা, তাঁহার এই একটী অসাধারণ সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে

তিনি স্বপ্রণীত অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্যের যশোবিস্তারের উন্মুখতা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলেন।

:—✳✳✳✳—

অসূয়া ছায়ারূপে সদ্‌গুণের অনুসরণ করে। ছায়ায় যেমন বস্তুর সত্তা প্রতি-পাদিত হয়, সেইরূপ অসূয়াও গুণের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া দেয়। কিন্তু রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় অসূয়িত সজ্জনের কোনরূপ মালিন্য প্রকাশ পায় না; প্রত্যুত অসূয়াপরায়ণ ব্যক্তিরই মলিনতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ।